চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে বিবেকানন্দের অবদান ও প্রসঙ্গ

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে বিবেকানন্দের অবদান ও প্রসঙ্গ

বিবেকানন্দের পরিচয় তিনি শুধুমাত্র একজন ধর্মপ্রচারক বা সন্ন্যাসী নন, সাহিত্যিকও বটে। বাগ্মী, অনুবাদক, গায়ক, শিল্পী ও কলা সমালোচক হিসেবেও তাঁর স্থান স্বতন্ত্র। তিনি বাংলা গদ্যে বীররসের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। 'ব্রহ্মবাদিন', 'প্রবুদ্ধ ভারত', 'উদ্বোধন' পত্রিকাগুলি তাঁর প্রেরণাতেই সৃষ্টি হয়। 'উদ্বোধন' পত্রিকা এখনও প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যে বিবেকানন্দের প্রভাব অপরিসীম। তাঁর মৌলিক বাংলা রচনার সংখ্যা স্বল্প হলেও সেগুলির আলাদা একটি বিশেষত্ব আছে। পরবর্তীকালে অনেক লেখাতেই তাঁর ব্যবহৃত ভাব-ভাষা ও আদর্শ অনুসৃত হয়েছে। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে 'বিবেকানন্দের সাহিত্যাদর্শ' সম্বন্ধে বলেছেন—

> "তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর মূল জীবনধর্মেরই অনুযায়ী—তিনি আদর্শায়িত সাহিত্যকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন, যদিও 'আদর্শায়িত' বলতে তিনি জীবন-বিরহিত কিছু মনে করেতেন না। বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক ও সংযোগ চাইই, সেখান থেকেই আহরণ করতে হবে প্রাণরস, কিন্তু জীবন মৃত্তিকাতেই আবদ্ধ—এমন নীচস্থ আধিভৌতিকতা তাঁর ছিল না। তিনি জীবনকে যতখানি বহির্গত ততোধিক অন্তর্নিহিত মনে করতেন। আর অন্তর ব্যাপারটিকে তিনি মনোবৈজ্ঞানিকদের বুদ্ধিবেষ্টনীতে কারারুদ্ধও করতে রাজি হননি। তাঁর কাছে অন্তর্জগৎ সীমাহারা। বলা চলে, সীমার বন্ধনকে ভাঙাই গভীর মানুষের জীবনের সাধনা। সাহিত্যকে এই বিরাট ভূমিকায় তিনি দেখতে চেয়েছেন।"[১]

বিবেকানন্দের প্রভাব সারা বিশ্বজুড়ে রয়েছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'আমরা' কবিতায় বিবেকানন্দ সম্বন্ধে লিখেছেন—

"বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়,—
বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়!"[২]

চলিত বাংলা বিবর্তনের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের একটা বড় ভূমিকা আছে। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন প্রচার ও প্রসারে স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য' শীর্ষক রচনায় বলেছেন—

> "চলিত বাংলার প্রথম সার্থক ও শক্তিমান রূপকার স্বামী বিবেকানন্দই। যদিও 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' তাঁর নিজের রচনা নয়, কিন্তু তাতে বিধৃত তাঁরই মুখের কথা—যা তাঁর 'শিষ্য' শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর উদ্দেশ্যে ব্যক্ত। যেহেতু এটি কথোপকথন, তাই এটি চলিত ভাষায় লেখা। চলিত বাংলা কত প্রাণবন্ত হতে পারে তার প্রমাণ এই গ্রন্থটি। এটি যেমন পূর্ণভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের বাহন, তেমনি সাহিত্যের শক্তিতে পরিপূর্ণ। পাশাপাশি 'শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক ভজন', 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ', 'সখার প্রতি', 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' এবং 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' প্রভৃতি সঙ্গীত ও কবিতা এবং প্রাণময় ভাবনা ও প্রেরণায় পরিপূর্ণ তাঁর বহুখ্যাত 'পত্রাবলী' বাংলা সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ অবদানের পরিচয়বাহী। প্রসঙ্গত একটি কথা বলতেই হয় যে, স্বামীজীর 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' ও 'পত্রাবলী' এবং 'সখার প্রতি' ও 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতা বাংলার মুক্তি-সংগ্রামের সৈনিকদের কাছে হয়ে উঠেছিল জাতীয়তাবাদের মন্ত্র-গীতা।"[৩]

বাংলা সাহিত্যের বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও প্রজ্ঞাবান মনীষীরা তাঁদের রচনায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমাসারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবকে স্বীকার

করেছেন। তাঁদেরকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি লেখা হয়েছে। বিবেকানন্দের উপস্থিতি পরবর্তীকালের সাহিত্যিকদের রচনায় কখনও সরাসরি এসেছে; আবার কখনওবা বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেম, মানবতাবাদ, সমাজভাবনা, শিক্ষাচিন্তা এককথায় তাঁর আদর্শ বিভিন্ন সাহিত্যিকের লেখায় স্থান পেয়েছে। বর্তমান সময়েও বিবেকানন্দ আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক। এপ্রসঙ্গে নির্মলকুমার নাগ তাঁর 'কেন বিবেকানন্দ, আজও!' নিবন্ধে বিবেকানন্দের প্রশস্তি করে লিখেছেন—

> "আজ ভারতবর্ষ যে-সঙ্কটের মুখে, যেখানে আত্মবিশ্বাস, বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা ছাড়া সমাধানের পথ নেই। উনিশ শতকের শেষে জাতপাতের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ যে-যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যের পরে তা আর দেখিনি।"[৪]

বিবেকানন্দের সমসাময়িক গুরুভ্রাতা, শিষ্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহীভক্তদের রচনায় যেমন বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ আছে, তেমনি পরবর্তীকালের পূজনীয় সন্ন্যাসীবৃন্দ, সাহিত্যিক প্রমুখের রচনায় বিবেকানন্দের প্রভাব লক্ষ করা যায়। আমরা বাংলা সাহিত্যের কিছু গ্রন্থ, প্রবন্ধ, কবিতা, উপন্যাস ও নাটকে বিবেকানন্দের প্রভাব ও প্রসঙ্গের আলোচনা করতে পারি।

'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থটি স্বামীজীর সাক্ষাৎ শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর লেখা। গ্রন্থটি রচনার প্রেক্ষাপট উল্লেখ করতে গিয়ে গ্রন্থকার 'উত্তরকাণ্ডের নিবেদন' অংশে জানিয়েছেন—

> "স্বামীজী যখন প্রথমবার বিলাত হইতে আসিয়া কলিকাতা বাগবাজার ঁবলরাম বসুর বাড়িতে অবস্থান করেন, তখন হইতে শিষ্যের সহিত

স্বামীজীর নানারূপ বিচার ও শাস্ত্র প্রসঙ্গ হইত। পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ঐ সময়ে একদিন তথায় উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিন তিনি শিষ্যকে বলেন যে, স্বামীজীর সহিত যেসব প্রসঙ্গ হয়, তাহা যেন লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে। মাস্টার মহাশয়ের আদেশে শিষ্য সেই সকল প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল—তাহাতেই বিস্তৃত আকারে 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' লিখিত হইয়াছে।"[৫]

গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর পরিচয় দিতে গিয়ে 'পূর্ব কাণ্ডের নিবেদন' অংশে শ্রীসারদানন্দ লিখেছেন—

"দেশ, সমাজ আচার, নীতি, ধর্ম প্রভৃতি যে-সকল বিষয়ের কর্তব্যাকর্তব্য অনুধাবন এবং মীমাংসা করিতে যাইয়া মানব-মন সন্দেহে দোলায়মান হইয়া দিঙ্‌নির্ণয়ে অক্ষম হয়, তত্তদ্বিষয় সম্বন্ধে পূজ্যপাদাচার্য শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজীর অলৌকিক দূরদৃষ্টি এবং অসাধারণ বহুদর্শিতা তাঁহাকে কি মীমাংসায় উপনীত করাইয়াছিল, গ্রন্থকার এই পুস্তকে তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার প্রযত্ন করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, যে শক্তিমান পুরুষের অদ্ভুত প্রতিভা এবং দিব্য চরিত্রবলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জগতের মনীষিগণই স্তম্ভিত হইয়া অনতিকালপূর্বে তাঁহাকে উচ্চাসন প্রদান করিয়াছিলেন, সেই মহামহিম স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ লোকচক্ষুর অন্তরালে, মঠে সর্বদা কিরূপ উচ্চভাবে কালক্ষেপ করিতেন, কিরূপ স্নেহে তাঁহার শিষ্যবর্গকে সর্বদা শিক্ষা-দীক্ষাদি প্রদান করিতেন, নিজ গুরুভ্রাতৃগণকে কিরূপ উচ্চ সম্মান প্রদান করিতেন এবং সর্বোপরি নিজ গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জীবনে-মরণে কিরূপভাবে অনুসরণ করিতেন, মধ্যে মধ্যে তদ্বিষয়ের পরিচয়ও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রদান করা হইয়াছে।"[৬]

শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন স্বামীজী সহজ-সরলভাবে উপমা, দৃষ্টান্তসহ। স্বামীজী বলেছেন—

> "শ্রদ্ধাবান হ, বীর্যবান হ, আত্মজ্ঞান লাভ কর, আর 'পরহিতায়' জীবনপাত কর—এই আমার ইচ্ছা ও আশীর্বাদ।"[৭]

স্বামী সারদানন্দের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' সাহিত্যগুণান্বিত গ্রন্থ। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমাসারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের নানা তথ্য ও ঘটনাবলী তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে ঠাকুরের লীলা, শিষ্য ও অনুরাগীদের কথাও তুলে ধরা হয়েছে। 'ঠাকুরের ভক্তসঙ্গ ও নরেন্দ্রনাথ' শীর্ষক অধ্যায়ে নরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে ঠাকুরের মনোভাবের কথা জানাতে গিয়ে লিখেছেন—

> "নবাগত শ্রেণীভুক্ত নরনারীদের তো কথাই নাই, পূর্বপরিদৃষ্ট ভক্তগণের ভিতরেও ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে কত উচ্চাসন প্রদান করিতেন তাহা বলা যায় না। উহাদিগের মধ্যে কয়েকজনকে নির্দেশ করিয়া তিনি বলিতেন, ইহারা ঈশ্বরকোটি, অথবা শ্রীভগবানের কার্যবিশেষ সাধন করিবার নিমিত্ত সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে। ঐ কয়েক ব্যক্তির সহিত নরেন্দ্রের তুলনা করিয়া তিনি এক দিবস আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "নরেন্দ্র যেন সহস্রদল কমল; এই কয়েকজনকে ঐ জাতীয় পুষ্প বলা যাইলেও; ইহাদিগের কেহ দশ, কেহ পনর, কেহ বা বড় জোর বিশদলবিশিষ্ট।" অন্য এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "এত সব লোক এখানে আসিল, নরেন্দ্রের মতো একজনও কিন্তু আর আসিল না।" দেখাও যাইত, ঠাকুরের অদ্ভুত জীবনের অলৌকিক কার্যাবলীর এবং প্রত্যেক কথার যথাযথ মর্ম গ্রহণ ও প্রকাশ করিতে তিনি যতদূর সমর্থ ছিলেন, অন্য কেহই তদ্রূপ ছিল না।"[৮]

শ্রীম (১৮৫৪-১৯৩২) বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বা মাস্টার মহাশয় রচনা করেন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'। এই গ্রন্থের পরিচয় দিতে গিয়ে স্বামী গম্ভীরানন্দ জানিয়েছেন—

> "রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুরোধে মাস্টার মহাশয় কর্তৃক বঙ্গভাষায় 'কথামৃত'-রচনা আরম্ভ হয় এবং ১৯০২ অব্দে স্বামী ত্রিগুণাতীতনন্দ কর্তৃক উহার প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। পরে ক্রমে ১৯০৪ অব্দে দ্বিতীয়ভাগ, ১৯০৮ অব্দে তৃতীয়ভাগ এবং ১৯১০ অব্দে চতুর্থভাগ মুদ্রিত হইল। ১৯৩২ অব্দে তাঁহার দেহত্যাগের কয়েক মাস পরে (১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে) পঞ্চম ভাগ প্রকাশিত হয়। তিনি ইহার আংশিক মুদ্রণ দেখিয়া গিয়াছিলেন।"[৯]

শ্রীম রামকৃষ্ণদেব ও বিবেকানন্দের সমসাময়িক এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারায় আকৃষ্ট মানুষ। প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য লাভ করার কারণে ঠাকুরের কথা ও বিভিন্ন প্রসঙ্গ তিনি তাঁর ডায়ারিতে লিখে রাখতেন। পরবর্তীকালে তা-ই 'কথামৃত' আকারে প্রকাশিত হয়। স্বামীজী শ্রীমকে বিপদের বন্ধু বলে উল্লেখ করেছেন। শ্রীম বরানগর মঠে সন্ন্যাসীভ্রাতাদের দুর্দিনে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীম বিবেকানন্দ সম্বন্ধে নানা তথ্য আমাদের দিয়েছেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থের 'নরেন্দ্রের প্রতি লোকশিক্ষার আদেশ' অংশে আমরা নরেন্দ্র ও মাস্টার মশায়ের কথোপকথনটি তুলে ধরতে পারি—

> "নরেন্দ্র— কাশীপুরে তিনি শক্তিসঞ্চার করে দিলেন।
>
> মাস্টার— যে সময়ে কাশীপুরের বাগানে গাছতলায় ধুনি জ্বেলে বসতে, না?
>
> নরেন্দ্র— হাঁ কালীকে বললাম, আমার হাত ধর দেখি। কালী বললে, কি একটা Shock তোমার গা ধরাতে আমার গায়ে লাগল।
>
> "এ-কথা (আমাদের মধ্যে) কারুকেও বলবেন না—Promise করুন।"

মাস্টার— তোমার উপর শক্তি সঞ্চার করলেন, বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, তোমার দ্বারা অনেক কাজ হবে। একদিন একখানা কাগজে লিখে বলেছিলেন, 'নরেন শিক্ষে দিবে।'

নরেন্দ্র— আমি কিন্তু বলেছিলাম, 'আমি ও-সব পারব না।'

"তিনি বললেন, 'তোর হাড় করবে।' শরতের ভার আমার উপর দিয়েছেন। ও এখন ব্যাকুল হয়েছে। ওর কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়েছে।"

মাস্টার— এখন পাতা না জমে। ঠাকুর বলতেন, বোধ হয় মনে আছে যে, পুকুরের ভিতর মাছের গাড়ি হয় অর্থাৎ গর্ত, যেখানে মাছ এসে বিশ্রাম করে। যে গাড়িতে পাতা এসে জমে যায়, সে গাড়িতে মাছ এসে থাকে না।"[১০]

ঠাকুরের কথা ব্যর্থ হয়নি। নরেন্দ্রনাথ প্রকৃতই শিক্ষা দিয়েছেন জগৎকে।

'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' গ্রন্থটি ভগিনী নিবেদিতার 'Notes of Some Wanderings With the Swami Vivekananda' গ্রন্থের অনুবাদ। এই গ্রন্থে হিমালয়, আলমোড়া, কাশ্মীর উপত্যকা, শ্রীনগর প্রভৃতি স্থানের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থের 'পূর্বাভাষ' অংশে উল্লেখ করা হয়েছে—

"ব্যক্তিগণ-স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁহার গুরুভ্রাতৃবৃন্দ ও শিষ্যমণ্ডলী। কয়েকজন পাশ্চাত্য অভ্যাগত এবং শিষ্য-ধীরামাতা, জয়া নাম্নী এক মহিলা ও নিবেদিতা তাঁহাদের অন্যতম। স্থান—ভারতের বিভিন্ন অংশ, কাল—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ।"[১১]

স্বামীজীর ভ্রমণসঙ্গী হিসেবে ছিলেন নিবেদিতা। সুতরাং স্বামীজীকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ ঘটে। নিজের অভিজ্ঞতার কথা ও স্বামীজীর কথা নিবেদিতা তুলে ধরেছেন এই গ্রন্থে। স্বামীজী সম্বন্ধে নিবেদিতা লিখেছেন—

"তিনি কেবল যে ধর্মবিষয়ক উপদেশই আমাদিগকে দিতেন, তাহা নহে। কখনও ইতিহাস, কখনও লৌকিক উপকথা, কখনও বা বিভিন্ন সমাজ, জাতি

বিভাগ ও লোকাচারের বহুবিধ উদ্ভট পরিণতি ও অসঙ্গতি—এ সকলেরও আলোচনা হইত। বাস্তবিক তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দের মনে হইত, যেন ভারতমাতা শেষ এবং শ্রেষ্ঠ পুরাণ-স্বরূপ হইয়া তাঁহার শ্রীমুখাবলম্বনে স্বয়ং প্রকটিত হইতেছেন।"[১২]

ভগিনী নিবেদিতার 'The Master as I Saw Him' গ্রন্থের অনুবাদ হল 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি'। গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন স্বামী মাধবানন্দ। এই গ্রন্থে মানসকন্যা নিবেদিতা স্বামীজীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নিবেদিতা ভারতবর্ষে চলে আসেন। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে মার্চ স্বামীজীর কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি সেবাকার্যে নিজেকে উৎসর্গ করেন। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে লণ্ডনে স্বামীজীর অবস্থান, উত্তর ভারত ভ্রমণ, অমরনাথ, শক্তিপূজা, হিন্দুধর্ম, নারীজাতি ও জনসাধারণ, পাশ্চাত্য সেবাব্রতীকে শিক্ষাদান প্রণালী, মহাসমাধি প্রভৃতি প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। 'কলিকাতা ও স্ত্রীভক্ত-পরিবার' শীর্ষক পরিচ্ছেদে নিবেদিতা স্বামীজী সম্পর্কে বলেছেন—

"তাঁহার অতি সামান্য কার্যও অর্থপূর্ণ ছিল, যাহা নূতন লোকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। একদিন যখন তিনি আমাকে কোন একটি পথ্য প্রস্তুত করিয়া দিতে বলেন, আমি তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, ঐ অনুরোধের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল। পরে যখন শুনিলাম, তাঁহার নিকট ঐ পথ্য লইয়া গেলে তিনি উহার সামান্য অংশ স্বয়ং গ্রহণ করিয়া বাকিটা উপস্থিত সকলের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছেন, তখন প্রকৃতই নিরাশ হইয়াছিলাম। এই কার্যের মধ্যে যে ধর্মানুষ্ঠানের একটা তাৎপর্য আছে, তাহা বুঝিতে পারি নাই। কী গভীর চিন্তা ও অনুকম্পার সহিত তিনি এবং তাঁহার পক্ষ হইয়া স্বয়ং শ্রীশ্রীমাও সর্বদা

আমাকে হিন্দু সমাজে (আমি তো একজন বিদেশী) আশ্রয় দিবার জন্য চেষ্টা করিতেন, তাহা অনুধাবন করিতে আমার অনেক মাস লাগিয়াছিল। কাশ্মীরে তিনি আমাকে বলেন যে, তাঁহার সমগ্র জীবনের উদ্দেশ্য "খ্রীস্টীয় ও ইসলাম ধর্মের ন্যায় হিন্দু ধর্মকে সক্রিয় এবং অপরের উপর প্রভাবশালী করা" আর যে সকল উপায় অবলম্বনে তিনি ঐ উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেন, এইটি তাহার অন্যতম।"[১৩]

'স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় ঊনবিংশ শতাব্দী' গ্রন্থে গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী উনিশ শতকের ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের চিত্র তুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থে বারোটি বক্তৃতা স্থান পেয়েছে। 'স্বামী বিবেকানন্দ-তাঁহার ধর্মজীবনের ক্রমবিকাশ' বক্তৃতায় বিবেকানন্দের চরিত্রের মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী বলেছেন—

"বিবেকানন্দের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলিয়া এক অতি প্রচণ্ড সারবান বস্তু ছিল। এবং ইহা অতি প্রচুর পরিমাণেই ছিল। এই স্বাতন্ত্র্যবোধ, এই আত্মসংবিৎ, এই প্রবল সত্যানুরাগ, এই তীব্র ব্যাকুলতা—ইহা ছিল বলিয়াই কি হিন্দুসমাজ, কি ব্রাহ্মসমাজ—কোন সমাজেই তিনি রাজা রামমোহনের ভাষায় "কেবল স্ববর্গের ক্রিয়ানুসারে কার্য করিতে" পারেন নাই। কেননা "তাহা পশু জাতীয়ের ধর্ম হয়।" তাঁহার প্রকৃতির মধ্যেই এমন একটি বস্তু ছিল, যাঁহার জন্য তাঁহাকে সমস্তই নিজের চক্ষে দেখিয়া লইতে হইয়াছে, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে অনুভব করিতে হইয়াছে। রামকৃষ্ণদেবকেও তিনি একদিনে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এ জন্য তাঁহাকে অনেক পরীক্ষা করিতে হইয়াছে—অনেক দিন লাগিয়াছে।"[১৪]

'বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ' গ্রন্থে মোহিতলাল মজুমদার উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিবেকানন্দের অবস্থান চিহ্নিত করেছেন। বিবেকানন্দের ভারতদর্শন, স্বদেশপ্রেম, মানবতাবাদ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থের 'প্রেম ও বৈরাগ্য' শীর্ষক অংশে মোহিতলাল স্বামীজী সম্বন্ধে বলেছেন—

> "যে শান্তি তাঁহার এত কাম্য, যে জীবন তাঁহার এত প্রিয়, তাহাই তো তিনি ত্যাগ করিয়াছেন! এই ত্যাগের শক্তি আসে কোথা হইতে? প্রেম ও বৈরাগ্য এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে তাঁহার জীবন জীর্ণ হইলেও তিনি ওই প্রেমেরই যজ্ঞানলে সেই জীবনকে আহুতি দিয়াছিলেন।"[১৫]

রোমাঁ রোলাঁ তাঁর 'বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী' গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে বিবেকানন্দকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন। মূল গ্রন্থটি ইংরেজিতে লেখা। গ্রন্থটি হ'ল 'The Life of Vivekananda and the Universal Gospel'। গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন ঋষি দাস। রোমাঁ রোলাঁ স্বামীজী সম্বন্ধে লিখেছেন—

> "তাঁহার কথাগুলি ছিল সংগীতের মতো; বীঠোফেনের মতো ছিল সেগুলির বাক্যাংশের বিন্যাস, এবং হ্যাণ্ডেলের মিলিত সংগীতের মতো ছিল সেগুলির প্রাণমাতানো ছন্দ। তাঁহার এই সকল কথা ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার লেখা বইগুলির মধ্যে বিক্ষিপ্ত আছে। কিন্তু তবু যখনই আমি সেগুলিতে হাত দিয়াছি, তখনই চকিতে তড়িৎ-স্পর্শ অনুভব করিয়াছি। কথাগুলি যখন সেই বীরের মুখ হইতে নিঃসৃত হইত তখন সেগুলি কী তড়িৎ-স্পর্শ, কী উন্মাদনাই না সৃষ্টি করিত!"[১৬]

প্রমথনাথ বসু তাঁর 'স্বামী বিবেকানন্দ' (প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ) গ্রন্থে সিমুলিয়ার দত্তবংশের পরিচয় থেকে শুরু করে মহাসমাধি পর্যন্ত স্বামীজীর

জীবনকথা আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটির শেষে স্বামীজীর কোষ্ঠীবিচার-এর উল্লেখ আছে। প্রমথনাথ বসু তাঁর স্বামী বিবেকানন্দ' (প্রথম ভাগ) গ্রন্থের 'অবতরণিকা' অংশে স্বামীজী সম্বন্ধে লিখেছেন—

> "তিনি বুঝিয়াছিলেন, সমাজসংস্কার বা রাজনীতিচর্চা দ্বারা এদেশের উন্নতি সম্ভব নহে। জ্ঞান, বৈরাগ্য, অহিংসা, নির্লোভতা, নিরহঙ্কার ও কর্মযোগ চিরদিন যে দেশের আদর্শ, সে দেশ ধর্মের উন্নতি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা উন্নত হইবে না। আর সে ধর্ম কতকগুলি লোকাচার ও দেশাচারের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে; তাহা আর্য ঋষিদিগের প্রচারিত উদার বেদান্ততত্ত্ব। তাই তিনি বেদান্তের বিজয়-দুন্দুভি ঘোষণা করিলেন—অমনি শতসহস্র ধর্মপিপাসুহৃদয় তাঁহার পতাকাতলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু বক্তা অনেক আছেন, পণ্ডিত অনেক আছেন, জ্ঞানী অনেক আছেন, কর্মীও অনেক আছেন, তথাপি এমনটি আর কখনও ঘটে নাই তাহার কারণ কি? তাহার কারণ তাঁহার চরিত্রের অদ্ভুত পবিত্রতা, আত্মশক্তিতে অদম্য বিশ্বাস ও আচণ্ডালে অকপট প্রেম। এই তিনটি প্রধান গুণ অন্য সকল গুণের ভিত্তিভূমি হইয়া তাঁহার চরিত্রকে এত অনুপম করিয়া তুলিয়াছে।"[১৭]

'স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থে মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত করেছেন। স্বামীজী সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

> "স্বামীজী বেদান্ত প্রচার করিয়া উহার এই মূর্ত বিগ্রহ শ্রীশ্রীঠাকুরকেও প্রচার করিয়াছেন। এবং এই যুগ-দেবতারই বার্তাবহরূপে তিনি একটি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় সারা পৃথিবী পরিক্রমা করিয়া গিয়াছেন। গিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠস্বর আজিও বাজে আমাদের প্রাণে, মনে, শ্রুতিতে। এবং

যতদিন—যত শতাব্দী ধরিয়া তাঁহার কাজ চলিবে, ততদিনই তাহা বাজিতে থাকিবে।”[১৮]

এই উক্তিটিই প্রমাণ করে আমাদের জীবনে স্বামীজীর প্রভাব কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁর ‘বিবেকানন্দ চরিত’ গ্রন্থে ‘বালক বিবেকানন্দ’, ‘সংস্কার যুগ’, ‘সাধক বিবেকানন্দ’, ‘পরিব্রাজক বিবেকানন্দ’, ‘আচার্য বিবেকানন্দ’, ‘যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ’ ও ‘মানবমিত্র বিবেকানন্দ’ নামে সাতটি অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দকে তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটি শ্রীরামকৃষ্ণলীলা সহচর ও স্বামীজীর গুরুভ্রাতা প্রেমানন্দ মহারাজকে উৎসর্গ করে লেখা। আলোচ্য গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী। বাংলা সাহিত্যের জীবনচরিত রচনার ধারায় ‘বিবেকানন্দ চরিত’ এক অভিনব সংযোজন। ‘সংস্কার যুগ’ অধ্যায়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার বলেছেন—

“বিগত শতাব্দীর সংস্কারকগণের মধ্যে কোনও কোনও ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিলেও মোটের উপর সংস্কারযুগকে বিবেকানন্দ বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই। বিবেকানন্দ ধ্বংসের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল সংগঠন। অথচ সংস্কারকদিগের আদর্শে যে গঠনের প্রস্তাব একেবারেই ছিল না, এ-কথা বলিলে তাঁহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে এবং বিবেকানন্দের আদর্শ ও কার্যপ্রণালীতে যে আবর্জনাকে পরিহারের চেষ্টা ছিল না, এ-কথা বলিলেও মিথ্যা বলা হইবে। তথাপি স্বামী বিবেকানন্দ ব্রাহ্মসংস্কার যুগের বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদস্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কে বলিবে যে, এই প্রতিবাদের আবশ্যক ছিল না? যাহাকে প্রতিবাদ করা যায়, তাহার সম্বন্ধে মানুষ বিশেষরূপেই সজাগ থাকে। সেই হিসাবে ব্রাহ্মযুগ সম্বন্ধে

বিবেকানন্দ বিশেষরূপেই সচেতন ছিলেন এবং তাহা ছিলেন বলিয়ায় একদিকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্রের সংস্কারের প্রভাব ও প্রতিবাদ যেমন তাঁহার মধ্যে দেখা দিয়েছে, তেমনি অন্যদিকে রাজনারায়ণ, বঙ্কিম ও ভূদেবের চিন্তাও সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাঁহার মধ্যে সংক্রমিত হইয়াছে। অথচ সমস্ত দিক হইতেই তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত প্রখরভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে, এক অতি অনুপম ভাস্বর দীপ্তিতে ইতিহাস আলোকিত করিয়া গিয়াছে। তাঁহার মানসিক বিকাশের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি তাঁহার পূর্বগামী সংস্কারযুগকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন।"[১৯]

গ্রন্থটি আজও বাঙালি পাঠকের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্বামী গম্ভীরানন্দের 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড) গ্রন্থটি জীবনীগ্রন্থের ধারায় এক অন্যতম সংযোজন এবং প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ। যথাযথ তথ্যের উপস্থাপন ও যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণে গ্রন্থটির গুরুত্ব অপরিসীম। স্বামী বিবেকানন্দের গুরুত্ব ও প্রভাব সম্পর্কে আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের 'পটভূমিকা' অংশে স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন—

"শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া নবজাগ্রত সনাতন ধর্ম নবীনপন্থী ব্রাহ্মসমাজের উপর এক প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হইয়াছিল।

ইহাই কিন্তু নবযুগের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। তাই অতঃপর আসিলেন শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্তবৃন্দ। ইঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া চিনিলেও তাঁহার জীবন ও বাণীর নবযুগোপযোগী কোন নূতন সার্থকতা খুঁজিয়া পাইলেন না। প্রাচীন ধারা, ভাষা ও প্রতীকাদি অবলম্বনে তাঁহাকে বুঝিতে যাইয়া তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হইলেন। অতএব প্রয়োজন হইল ইয়ং বেঙ্গলের—বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকবৃন্দের, যাঁহাদের দেহে

ছিল বল, মনে ছিল অদম্য উৎসাহ, আর যাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গি গতানুগতিক পথ ভিন্ন অন্য পথে না চলিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া যায় নাই, সত্যের জন্য যাঁহারা উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন তাঁহাদের হৃদয়ের সমস্ত দ্বার। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে সর্বাগ্রণী ছিলেন শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত (ভাবী আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ)। ইঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু আত্মরক্ষা করা নহে, প্রত্যুত আত্মজ্ঞান, আত্মশ্রদ্ধা ও আত্মসমাধি লাভ করা এবং অপরকেও ঐ কার্যে সাহায্য করা।"[২০]

স্বামী গম্ভীরানন্দের অপর গ্রন্থ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা' (অখণ্ড)। এই গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের ষোলজন পার্ষদ ছাড়াও পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, মথুরানাথ বিশ্বাস, শম্ভুচরণ মল্লিক, নাগ মহাশয়, বলরাম বসু, মাস্টার মহাশয়, অধরলাল সেন, অক্ষয়কুমার সেন, রাণী রাসমণি, গোপালের মা, লক্ষ্মীদিদি প্রমুখের সম্বন্ধে বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরেছেন।

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ তাঁর 'বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে বিবেকানন্দের সাহিত্যচিন্তা ও রচনাগুলির পরিচয় তুলে ধরেছেন। স্বামী অপূর্বানন্দ 'যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে চলিত ভাষায় স্বামীজীর জীবনী লিখেছেন। জীবনী সাহিত্যের ধারায় অভিনব সংযোজন এটি। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকীতে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ লিখেছেন 'স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থটি। 'বহুরূপে বিবেকানন্দ' গ্রন্থে স্বামী চেতনানন্দ বিবেকানন্দকে নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন।

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' (সাত খণ্ডে), 'স্বামী বিবেকানন্দ নতুন তথ্য নতুন আলো', 'বিবেকানন্দ শরণে বিদেশিনী', 'সহাস্য বিবেকানন্দ' প্রভৃতি বিবেকানন্দকে নিয়ে লেখা মহামূল্যবান গ্রন্থ।

'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থটি ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে আকাদেমি পুরষ্কার প্রাপ্ত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধি (১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট) থেকে শুরু করে বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য গমনের পরিকল্পনা ও আয়োজন, আমেরিকা থেকে ইংল্যান্ড, সংস্কার আন্দোলন ও বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দ ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার, বিবেকানন্দের শিল্পচিন্তা, বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সাহিত্যাদর্শ, বিবেকানন্দ ও জাতীয় আন্দোলন, রামকৃষ্ণ মিশন ও বিপ্লব আন্দোলন প্রভৃতি শিরোনামে বিবেকানন্দের কথা তুলে ধরা হয়েছে এই গ্রন্থে। 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' (প্রথম খন্ড) গ্রন্থের প্রস্তাবনা অংশে শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন—

> "স্বামীজীর জীবন মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না—অবিরাম দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়েছে। তৎকালীন ভারতের প্রায় সকল সম্প্রদায় ও স্বার্থগোষ্ঠী তাঁর বিরোধিতা করেছে। অনেকের বিরোধিতা তাঁর মতাদর্শের বিরুদ্ধে এবং সেটা স্বাভাবিক, কারণ নূতন আবির্ভাব পুরাতনকে বিচলিত করেই, তার প্রতিক্রিয়াও বটে। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে দেখা গেছে—মতের বিরোধিতায় সন্তুষ্ট না থেকে কোনো-কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত আক্রমণের পর্যায়ে নেমে পড়েছিলেন। পটভূমিকাসুদ্ধ সে সমস্ত সংবাদ আমি তুলে ধরেছি।"[২১]

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম। 'সহাস্য বিবেকানন্দ' গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দের হাস্য পরিহাস অর্থাৎ রসিক বিবেকানন্দের পরিচয় আমরা পাই। শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেছেন—

> "বিবেকানন্দের রসিকতার হিসেব নিতে গিয়ে মনে হয়েছে—এ এক অপূর্ব বিচিত্র সংগ্রহশালা। হেন রসিকতা নেই যা তিনি করেননি। ঠাট্টা-তামাশা,

মজা-মশকরা, রঙ্গ-ব্যঙ্গ, হাসি-হুল্লোড়, গাল-গল্প, ফিচলেমি-ফাজলামি, স্ফূর্তি-ইয়ার্কি, আমোদ-কৌতুক, শ্লেষ-বিদ্রূপ, উপহাস-পরিহাস, রস-রহস্য-কী নেই সেখানে? ইংরেজি হাস্যরসের আওতায় যা-কিছু এসে যায়—উইট, স্যাটায়ার, আয়রনি, ফান, হিউমার—প্রায় সবই তাঁতে পাওয়া যায়। উইট বা বাকচাতুরীতে তিনি পারদর্শী; কথার পিঠে কথা বলতে, দ্রুত চোখা উত্তরে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে তাঁর তুল্য ক্ষমতা অল্পই দেখা যায়। কিন্তু উইটের তরবারি-ঝলক দেখানোর চেয়ে তাঁর বেশী আগ্রহ ছিল স্যাটায়ারের কোপ বসাতে—অনাচারের বুকে যা কেটে বসবে। কিন্তু আঘাত নয়, প্রেমই বিবেকানন্দের প্রধান অস্ত্র।"[২২]

'বিবেকানন্দ শরণে বিদেশিনী' গ্রন্থে শঙ্করীপ্রসাদ বসু জোসেফিন ম্যাকলাউড, সারা এলেন ওয়ালডো এবং এমা কালভে এই তিনজন বিদেশিনীর কথা তুলে ধরেছেন। উপরোক্ত তিনজন বিদেশিনীর দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ কেমন ছিলেন সে কথাও তুলে ধরা হয়েছে। শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেছেন—

"এই বইয়ে বিদেশিনী নারীর নয়ন, মন ও জীবনে উদ্ভাসিত বিবেকানন্দকে দেখবার চেষ্টা আমরা করেছি।"[২৩]

শংকর-এর লেখা 'অচেনা অজানা বিবেকানন্দ' (নভেম্বর, ২০০৩), 'আমি বিবেকানন্দ বলছি' (নভেম্বর, ২০০৮), 'অবিশ্বাস্য বিবেকানন্দ' (ডিসেম্বর, ২০১০), 'আশ্চর্য বিবেকানন্দ' (কলকাতা বুকফেয়ার জানুয়ারি, ২০১৪) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, সারদাদেবী ও বিবেকানন্দের আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা রেখে শংকর লিখেছেন উপরোক্ত গ্রন্থগুলি। স্বামীজী প্রসঙ্গে 'অচেনা অজানা বিবেকানন্দ' গ্রন্থে শংকর লিখেছেন—

"মহাসমাধির দু'বছর আগে (এপ্রিল ১৯০০) স্বামীজি তাঁর অনুরাগিণী মার্কিনী বান্ধবী মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডকে আশ্চর্য এক চিঠি লিখেছিলেন আলমোড়া থেকে।

আসন্ন বিদায়ের কথা মনে না থাকলে এমন চিঠি লেখা যায় কিনা তা বিবেচনার ভার পাঠকের ওপরেই ছেড়ে দিতে চাই। কতবার যে স্বামীজির লেখা এই ক'টা লাইন পড়েছি তার হিসেব নেই, কিন্তু প্রতিবারের বাণীটা নতুন মনে হয়। মনে হয় সমকালের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ অনন্তকালের সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।

স্বামীজি লিখেছেন : "আমি যে জন্মেছিলাম—তাতে খুশি; এতো যে কষ্ট পেয়েছি—তাতেও খুশি; জীবনে যে বড় বড় ভুল করেছি—তাতেও খুশি। আবার এখন যে নির্বাণের শান্তি-সমুদ্রে ডুব দিতে যাচ্ছি—তাতেও খুশি; আমার জন্যে সংসারে ফিরতে হবে, এমন বন্ধনে আমি কাউকে ফেলে যাচ্ছি না; অথবা এমন বন্ধন আমি কারও থেকে নিয়ে যাচ্ছি না। দেহটা গিয়েই আমার মুক্তি হোক, অথবা দেহ থাকতে থাকতে মুক্ত হই, সে পুরনো 'বিবেকানন্দ' কিন্তু চলে গেছে, চিরদিনের জন্য চলে গেছে—আর ফিরছে না! শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য বিবেকানন্দ চলে গেছে—পরে আছে কেবল সেই বালক, প্রভুর সেই চির শিষ্য, চির পদাশ্রিত দাস।"

এই বিবেকানন্দই বোধহয় মানুষের হৃদয় মন্দিরে অনন্তকাল ধরে পূজিত হবেন।"[২৪]

স্বামীজীর প্রভাব অনন্তকাল ধরেই মানুষের মনে থাকবে এ কথা বলা যায়। 'আশ্চর্য বিবেকানন্দ' গ্রন্থে শংকর বিবেকানন্দের জীবনের বিচিত্র দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। শংকর-এর অনুসন্ধানে বিবেকানন্দ নতুনরূপে উপস্থিত

হয়েছেন এই গ্রন্থে। 'সন্ন্যাসীর স্বীকারোক্তি', 'চিরযৌবনের দূত', 'যেমন গুরু তেমন শিষ্য', 'গুরুপত্নী পরিচয়', 'গুরুর নামাঙ্কিত মঠ-মিশন কি আসলে ব্রান্ড বিবেকানন্দ?', 'ব্রান্ড রামকৃষ্ণ ও ব্রান্ড বিবেকানন্দ কি এক নয়?', '১৫০ নট আউট' প্রভৃতি শিরোনামে আলোচনা অভিনবত্বের পরিচয় বহন করে। '১৫০ নট আউট' শীর্ষক আলোচনায় স্বামীজীর প্রভাব সম্বন্ধে শংকর বলেছেন—

> "১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দ মহাপ্রয়াণের পর একটা শতাব্দীর বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। ভক্তজনদের আনন্দ এই সময়ে স্বদেশে ও বিদেশে সাধক শিক্ষক ও সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সম্মান ও স্বীকৃতি বেড়েই চলেছে, সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে এই শ্রদ্ধা তুঙ্গে উঠেছে বলেই পূর্ব-পশ্চিমের অনুরাগীদের ধারণা, কারও কারও বিশ্বাস বীরসন্ন্যাসীর বাণীগুলি পুনর্বার পাঠ করে নতুন যুগের ভারত এবং সদাপরিবর্তনশীল পশ্চিম তাঁদের একবিংশ শতকের জীবনযাত্রার নতুন পাথেয় খুঁজে পাবেন।"[২৫]

বিশ্বজুড়ে বিবেকানন্দের প্রভাব বর্তমান। আলোচ্য গ্রন্থের আর একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। শংকর লিখেছেন—

> "স্বামীজির জীবিতকালে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বাণী নিয়ে পাশ্চাত্য মনীষীরা তেমন কোনো বড় কাজ করেননি। যা হওয়ার তা হয়েছে পরবর্তী এক শতাব্দীতে এবং সেই কাজে নিঃশব্দ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এদেশ থেকে সুদূর বিদেশে প্রেরিত ভারতীয় সন্ন্যাসীরা, বিশেষ করে স্বামী প্রভবানন্দ, স্বামী অশোকানন্দ এবং স্বামী নিখিলানন্দ। পাশ্চাত্যের বিখ্যাত এবং প্রাতঃস্মরণীয় লেখকদের মধ্যে রয়েছেন ম্যাক্সমুলার, রোমাঁ রোলাঁ, আলডাক্স হাক্সলি, হেনরি মিলার, ক্রিস্টোফার ইশারউড এবং জে. ডি সেলিংগার। বেদান্তবাণী সম্পর্কে

এঁরা কলম ধরতেই যেন বিশ শতকে পশ্চিমের দৃষ্টি হঠাৎ খুলে গেল, ঠাকুর-স্বামীজি সারা বিশ্বে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন।"[২৬]

নতুন প্রজন্মের যুবক-যুবতীদের কাছে স্বামীজীর প্রভাব ক্রমবর্ধমান।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বামী বিবেকানন্দ এক অনন্ত জীবনের জীবনী' (চার খণ্ডে), 'সর্বত্র শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাসারদা ও স্বামী বিবেকানন্দ', 'নির্বাচিত বিবেকানন্দ' প্রভৃতি বিবেকানন্দ বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের জীবনে স্বামীজীর প্রভাব অপরিসীম। তাঁর 'মন্ত্র' রচনায় তিনি বলেছেন—

"ঠাকুর আমাকে একটি বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরিয়ে দিয়েছেন। সেই জ্যাকেটের নাম স্বামী বিবেকানন্দ। ইস্পাতসম রামকৃষ্ণ-ভাব-তন্তু দ্বারা নির্মিত সেই আবরণী।"[২৭]

'আমার জীবনে 'উদ্বোধন' শীর্ষক রচনায় সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন ১৯৫৪ সাল থেকে 'উদ্বোধন' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তিনি বলেছেন—

"শ্রদ্ধানন্দজী আমাকে স্বামীজীর ঘরে নিয়ে গিয়ে বলতেন : 'স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর হলো 'উদ্বোধন'। এই ঘরে দাঁড়িয়ে তাঁর অদৃশ্য শক্তি গ্রহণ করার চেষ্টা কর—'স্পিরিট অব স্বামীজী'। এই যে ঠাকুরের মন্দির—এটি ইট আর পাথরে তৈরি, আর 'উদ্বোধন' হলো অক্ষরে গাঁথা বেলুড় মঠ। মানুষ মঠে যায়, 'উদ্বোধন' বাড়িতে বাড়িতে যায়। মলাটটি খোলা মাত্র ছড়িয়ে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা, স্বামীজীর ভাবতরঙ্গ।"[২৮]

এছাড়াও 'কে তুমি বিবেকানন্দ', 'পথ ছাড়', 'একটি নমস্কারে', 'শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু উৎসব' প্রভৃতি লেখায় উঠে এসেছে স্বামীজীর কথা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা' উপন্যাসে বিবেকানন্দের ছায়াপাত ঘটেছে। সুনীল গঙ্গোপাপাধ্যায়ের 'প্রথম আলো' উপন্যাসটি প্রথম পর্ব জানুয়ারি ১৯৯৬

এবং দ্বিতীয় পর্ব ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত। 'প্রথম আলো' উপন্যাসের 'লেখকের কথা' অংশে তিনি বলেছেন—

> "স্বামী বিবেকানন্দের তামাক ও ইলিশ মাছের প্রতি আসক্তি, কৌতুক প্রবণতা, কৌতুকের ঝোঁকে প্রাকৃতজনের মতন ভাষা ব্যবহার তাঁকে আমাদের অনেক কাছের মানুষ করে তোলে।"[২৯]

শ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার কথা উপন্যাসের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন পর্ব থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত আলোচনা করেছেন ঔপন্যাসিক। নিবেদিতার সঙ্গে কথোপকথন সূত্রে স্বামীজী বলেছেন—

> "বড় গাছের ছায়া ছোট গাছগুলোকে বাড়তে দেয় না। তাদের জায়গা করে দেবার জন্যই আমাকে যেতে হবে। আমি চলে গেলেও কাজ থেমে থাকবে না চলবে। তা একটা বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নেবে। মনে কোরো না, এটা আমার নিছক স্বপ্ন বা কল্পনা, এ আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।"[৩০]

স্বামীজীর সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। বেলুড় মঠে গড়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়।

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাণসখা বিবেকানন্দ' উপন্যাসটি তিনটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড ১২ জানুয়ারি ২০১৪, দ্বিতীয় খণ্ড জানুয়ারি ২০১৫ এবং তৃতীয় খণ্ড জুলাই ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। স্বামীজীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনকথাকে নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। আলোচ্য উপন্যাসে ঔপন্যাসিক 'ওই মহামানব আসে', 'পিনাকেতে লাগে টঙ্কার', 'প্রথম আলোর চরণধ্বনি',

‘দেহমনের সুদূর পারে’ প্রভৃতি শিরোনাম ব্যবহার করে স্বামীজীর কথাকে তুলে ধরেছেন। ঔপন্যাসিক স্বামীজীর দেহত্যাগের পর বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> “একটি সুন্দর গালিচার উপর শায়িত দিব্যভাবদীপ্ত, বিভূতি-বিভূষিত বিবেকানন্দ। তাঁর মাথায় ফুলের মুকুট। তাঁর পরনে নবরঞ্জিত গৈরিক বসন। তাঁর প্রসারিত ডান হাতের আঙুলে জড়িয়ে আছে রুদ্রাক্ষের জপমালাটি। তাঁর পদ্মপাতার মতো চোখ দুটি ধ্যানমগ্ন শিবের চোখ—অর্ধনিমীলিত, অন্তর্মুখী অক্ষিতারা।”[৩১]

‘প্রাণসখা বিবেকানন্দ’ উপন্যাসের মাধ্যমে রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। ড. মণি ভৌমিক ‘আমি নরেন বিদেশে বিবেকানন্দ’ গ্রন্থটিতে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন বিবেকানন্দের প্রতি। অভিজিৎ চৌধুরীর ‘অনুগামিনী’ উপন্যাসটিও বিবেকানন্দকে নিয়ে লেখা।

ড. শান্তি সিংহ বিবেকানন্দের জীবনকে নিয়ে ‘বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ’ নামে একটি নাটক রচনা করেন। নাটকটি ‘উদ্বোধন’ পত্রিকায় ১৪০৫ শারদীয়া সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে ২০১২ খ্রিস্টাব্দের কলকাতা-বইমেলায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির ‘প্রাক্‌কথন’ অংশে নাট্যকার লিখেছেন—

> “ক্ষণজন্মা বিবেকানন্দ অনতিক্রান্ত চল্লিশ বর্ষ আয়ুষ্কালে, সারা বিশ্বে অসাধারণ জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগী রূপে বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর জলদমন্দ্র উচ্চারণে— “উত্তিষ্ঠিত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত”—উপনিষদের এই বাণী ভারত তথা বিশ্ববাসীর অন্তরে সঞ্চার করেছে নবজীবনের সঞ্জীবনী মন্ত্র! শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর থেকে নরেন তথা বিবেকানন্দের বহুমাত্রিক জীবনেতিহাসের বিশেষ কিছু ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করে এই নাটকটি রচিত।”[৩২]

মেরি লুইজ বার্ক তাঁর ‘পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ-নতুন তথ্যাবলী’ (ছয় খণ্ডে রচিত) গ্রন্থে পাশ্চাত্যে স্বামীজী কিভাবে জীবন অতিবাহিত করেছেন ও নানা অনুকূল-প্রতিকূল ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন সেইসব প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যানুরাগী পাঠক সমাজে গ্রন্থটির তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।

স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশত জন্মবর্ষের স্মারকগ্রন্থ হিসেবে প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা সম্পাদিত ‘ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে’ গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। পূজনীয় সন্ন্যাসীবৃন্দ এবং প্রজ্ঞাবান মানুষজনদের লেখায় বিবেকানন্দের প্রভাব উঠে এসেছে এই গ্রন্থে। ‘সম্পাদিকার নিবেদন’ অংশে প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা বর্তমান সময়েও স্বামীজীর প্রভাব সম্বন্ধে লিখেছেন—

> “এই একুশ শতকেও তাঁকে নিয়ে মানুষ চিন্তাভাবনা করে চলেছে। কারণ আজ সমস্যার আঁধার ঘনিয়ে এসেছে শুধু ভারতে নয়, বিশ্বের অন্যান্য দেশেও। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ধ্রুবজ্যোতির মতন পথের নির্দেশ দেবে— এই কথা অনেক আগেই মনীষীরা বলেছেন। এই শতকে আবার চিন্তানায়ক বিবেকানন্দকে ঘিরে আলোড়ন জেগেছে। তাঁর আলোকবর্ষী সংগ্রামী জীবন আজও বিস্ময় আর প্রেরণার উৎস। প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষে তিনি আমাদের সামনে পথনির্মাণ করেছেন। মানুষ-গড়ার সাধনায় সামিল করতে চেয়েছেন জাতিকে। প্রসারিত হতে বলেছেন সংকীর্ণ বৃত্ত ভেঙে। স্বদেশ-বিদেশে এক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মিলনসেতু রচনা করে আহ্বান জানিয়েছেন যুবশক্তিকে।”[৩৩]

বিশ্বজিৎ রায়ের বিবেকানন্দ বিষয়ক উল্লেখযোগ্য দুটি গ্রন্থ হ’ল ‘স্বামী বিবেকানন্দ বাংলা রচনা সংকলন’ (সম্পাদিত), ‘রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ

স্বদেশে ও সমকালে'। তিনি 'স্বামী বিবেকানন্দ বাংলা রচনা সংকলন'-এর 'প্রবেশক' অংশে বলেছেন—

> "বাংলা ভাষা সম্বন্ধে বিবেকানন্দের মনোভাব কী ছিল ও তাঁর বাংলা ভাষার লিখন রীতিটি কেমন তার বিশ্লেষণ দরকার। বিবেকানন্দ কবি, সাহিত্যমনস্ক, স্বাদু গদ্যের রচয়িতা, চলিত ভাষার ব্যবহারকারী, সন্ন্যাসী হয়েও বাংলা ভাষা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন শুধু এই ক-টা কথাই যথেষ্ট নয়। এ বিষয়গুলি নিয়ে শঙ্করীপ্রসাদ বসু, প্রণবরঞ্জন ঘোষ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহে। বিবেকানন্দের বাংলা লেখা পত্রের রচনাসংকলনের প্রবেশক হিসেবে এই নিবন্ধটিতে তাঁর বাংলা রচনার রীতিনীতিমাত্র নয়, দেশকালের সঙ্গে বিবেকানন্দের বাংলা ভাষা প্রকল্পের যোগসূত্রটি কী তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।"[৩৪]

স্বামীজী তাঁর জীবনের শেষদিনে বলেছিলেন—

> "যদি এখন আর একজন বিবেকানন্দ থাকিত, তাহা হইলে সে বুঝিতে পারিত, বিবেকানন্দ কি করিয়াছে!! কিন্তু কালে অবশ্য অনেক বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করিবে।"[৩৫]

স্বামীজীর এই উক্তির একমাত্র সাক্ষী ছিলেন পূজনীয় প্রেমানন্দজি মহারাজ। উপরোক্ত উক্তিটিই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন স্বামীজীর জীবন ও বাণীর মূল্যায়নের মানদণ্ডকে চিহ্নিত করে। শিকাগো বক্তৃতার ১২৫ বৎসর উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আলোচনাসভা ছাড়াও ক্যুইজ, বক্তৃতা, অঙ্কন প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। 'উদ্বোধন' ও 'দেশ' পত্রিকায় নানা মনোজ্ঞ প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। 'উদ্বোধন' পত্রিকায় এখনও ধারাবাহিকভাবে বিবেকানন্দ প্রসঙ্গের আলোচনা হয়ে থাকে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। 'দেশ' পত্রিকায় শিকাগো

বক্তৃতার ১২৫ বৎসর উপলক্ষে স্বামী সুবীরানন্দ, স্বামী বিমলাত্মানন্দ, প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণা তাঁদের চিন্তাভাবনা ব্যক্ত করে স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন।

উল্লেখপঞ্জী

১। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, পঞ্চম খণ্ড, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৯, অষ্টম মুদ্রণ নভেম্বর ২০১৭, পৃ. ১৪৯।

২। কাব্য-সঞ্চয়ন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, পরিচায়িকা- শীতল চৌধুরী, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, পুনর্মুদ্রণ : নভেম্বর, ২০১৬, পৃ. ২৮।

৩। শারদীয়া সংখ্যা, উদ্বোধন, আশ্বিন ১৪২০, নবম সংখ্যা, পৃ. ৬৪৮-৬৪৯।

৪। উদ্বোধন, শ্রাবণ ১৪২৫, সপ্তম সংখ্যা, ১২০তম বর্ষ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পৃ. ৪৯০।

৫। স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩, দ্বাবিংশতি পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪১৩, পৃ. ৪।

৬। স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩, দ্বাবিংশতি পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪১৩, পৃ. ৩।

৭। স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩, দ্বাবিংশতি পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪১৩, পৃ. ২৬৬।

৮। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, দ্বিতীয়ভাগ, স্বামী সারদানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩, ৪০তম পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪২২, পৃ. ১৩০।

৯। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, শ্রীম-কথিত, দ্বিতীয় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২৯তম পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪১৬, পৃ. ১১৮৪।

১০। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, শ্রীম-কথিত, দ্বিতীয় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২৯তম পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪১৬, পৃ. ১১৩৮-১১৩৯।

১১। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, প্রকাশক : স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩, ২৪তম পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪২০, পৃ. ১৬৯।

১২। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, প্রকাশক : স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩, ২৪তম পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪২০, পৃ. ১৭০।

১৩। স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, ভগিনী নিবেদিতা, অনুবাদক-স্বামী মাধবানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩, ২৩তম পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪১৭, পৃ. ৯৩।

১৪। স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় ঊনবিংশ শতাব্দী, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, সম্পাদনা : রঞ্জিত সেন, অরুণা প্রকাশন, ২ কালিদাস সিংহ লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ২৩৪-২৩৫।

১৫। বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, মোহিতলাল মজুমদার, সম্পাদনা-বারিদবরণ ঘোষ, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম পারুল সংস্করণ ২০১৩, পৃ. ৩১।

১৬। বিবেকানন্দের জীবন, রোমাঁ রোলাঁ, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, সি২৯-৩১ ও ৪৮ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কোলকাতা-৭০০০০৭, নবম সংস্করণ : ১লা বৈশাখ ১৪২৪, পৃ. ১০৮।

১৭। স্বামী বিবেকানন্দ (প্রথম ভাগ), প্রমথনাথ বসু, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩, দ্বাদশ পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৪২২, পৃ. ১৬।

১৮। স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীমানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩, ১১তম পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩, পৃ. ৪৭১।

১৯। বিবেকানন্দ চরিত, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা-৭০০০০০৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, পৃ. ৫০।

২০। যুগনায়ক বিবেকানন্দ (প্রথম খণ্ড), স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩, ২৬তম পুনর্মুদ্রণ আশ্বিন ১৪২০, পৃ. ১১।

২১। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (প্রথম খণ্ড), শঙ্করীপ্রসাদ বসু, মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯, দ্বাদশ মুদ্রণ আগস্ট ২০১৪, পৃ. ঞ।

২২। সহাস্য বিবেকানন্দ, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, নবভারত পাবলিশার্স, ৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০০০৯, অষ্টম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. ৫-৬।

২৩। বিবেকানন্দ শরণে বিদেশিনী, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৪, মাঘ ১৪১০, পৃ. ৯-১০।

২৪। অচেনা অজানা বিবেকানন্দ, শংকর, সাহিত্যম্, ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, চতুর্বিংশ সংস্করণ : মার্চ ২০১৪, পৃ. ২৮৬।

২৫। আশ্চর্য বিবেকানন্দ, শংকর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, সপ্তম সংস্করণ, অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ২৪৪।

২৬। তদেব, পৃ. ২৮৩।

২৭। সঞ্জীব রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, লালমাটি, প্রকাশক : নিমাই গরাই, ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, লালমাটি সংস্করণ বইমেলা ২০০৯, পৃ. ৭০৭।
২৮। তদেব, পৃ. ৭০৬।
২৯। প্রথম আলো, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : প্রথম পর্ব জানুয়ারি ১৯৯৬। দ্বিতীয় পর্ব জুলাই ১৯৯৭, চতুর্থ মুদ্রণ জুন ২০১২, পৃ. ১১৩০।
৩০। তদেব, পৃ. ৯২১।
৩১। প্রাণসখা বিবেকানন্দ, তৃতীয় খণ্ড, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, পত্রভারতী, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০১৫, পৃ. ৩৫৭-৩৫৮।
৩২। বিশ্ববিবেক বিবেকানন্দ, ড. শান্তি সিংহ, নীলাক্ষর, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : কলকাতা-বইমেলা, ২০১২, পৃ. ৭।
৩৩। ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে, সম্পাদনা : প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা, শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা-৭০০০৭৬, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৯।
৩৪। স্বামী বিবেকানন্দ বাংলা রচনা সংকলন, বিশ্বজিৎ রায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৪, প্রথম প্রকাশ : ১৫ মার্চ ২০১৩, পৃ. ৯-১০।
৩৫। বিবেকানন্দ চরিত, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত, দ্বিতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, পৃ. ২৯৩।